Downloaded from: justpaste.it/7vcv4

আমরা যাদের উত্তরসূরী

-মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী রহ.
মোঃ শফিকুল আমীন

==

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এ বিশ্ব চরাচরে তার মনোনীত খলিফা পাঠিয়েই খান্ত হননি, তার সাথে পাঠিয়েছেন তাদের পার্থিব জীবন চলার পথের যুগোপযোগী জীবন বিধান। যুগে যুগে এই খলিফা তথা নবী রাসুলগণের মাধ্য দিশা হারা মানব জাতিকে দিশাদানের মানসে আখেরী পয়গম্বর পর্যন্ত এ জীবন বিধান পাঠিয়ে হেদায়েতের পথ অব্যাহত রেখেছেন। আম্বিয়া ও রাসূল যুগ যখন শেষ তখন পরবর্তী প্রজন্মদের জীবন চলায় পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বর্তায় নায়েবে নবী অর্থাৎ নবী প্রতিনিধিগণের ওপর। তারা যুগে যুগে পথ হারা প্রাণ গুলিকে পথ প্রদর্শিত করতে গিয়ে কেউ কেউ অকাতরে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে, কেউবা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আবার কেউ প্রহারের যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারিয়েছেন। এ রকম জীবনের ঝুকি নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে সকল প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে ইসলামের বিজয় নিশানকে উঁচিয়ে রাখতে যারা সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

বাংলা ১৩২৬ সনের শীত ঋতুর কোন এক শুক্রবারের ভোর বেলায় সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কামার খন্দ থানার অন্তর্গত পাইকশা গ্রামের মুন্সী জসিম উদ্দিন আখন্দের ঘরে এই প্রতিভার জন্ম। মুন্সী জসিম উদ্দিন আখন্দ ছিলেন বংশানুক্রমে ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। অত্র এলাকায় ধার্মিক পরিবার হিসেবে মাওলানা ইসমাইলের পরিবার খুবই পরিচিত। পাঁচ বছর বয়সের সময় শিশু ইসমাইলকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর পিতা মুন্সী জসিম উদ্দিন বালক ইসমাইলকে প্রখ্যাত তাপস মাওলানা জাবেদ আলী সাহেবের আশ্রয়ে দিয়ে ঐতিহ্যবাহী ডিগ্রীচর মাদ্রাসায় লেখাপড়ার সুযোগ দান করেন। এখানে কিছু দিন শিক্ষালাভের পর চলে যান সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চ শিক্ষার জন্যে চলে যান নোয়াখালী জেলার এক ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষাগ্রহণের পর কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে ফাজিল (জামায়াতে উলা) উত্তীর্ণ হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মাওলানা ইসমাঈল ছাত্র জীবন থেকে যথেষ্ট মেধার পরিচয় দেন। যে রকম ছিল তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অনুরূপছিল তার বুদ্ধিমত্তা। ছোট বেলা থেকেই সদাচারিতা ও ইসলামী বিধান পালনে তিনি ছিলেন খুবই আন্তরিক ।

দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষা জীবন থেকেই তিনি ইসলামী বিভিন্ন সংগঠন ও পীর মাশায়েখের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে কি করে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় সে জন্য সব সময় তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। জামাতে উলা উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বীনকে আরও গভীরভাবে জানার মানসে শিক্ষার উচ্চাশিখরে আরোহনের জন্য উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল তাফসীর,হাদীস, ফিকাহ, আকাইদ,বিভিন্ন শাস্ত্র উত্তমভাবে অধ্যয়ন করেন।এর প্রতিটি বিষয়ে তিনি প্রচুর বুৎপত্তি লাভ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫০ ইং

সনে স্বগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সাহেবের বাড়ী সিরাজগঞ্জে হওয়ার কারণে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো তাকেও গোটা উত্তর বঙ্গের লোক সিরাজী সাহেব বলে আখ্যায়িত করতেন, কিন্তু এই দুই মনিষীর জীবনকালের মধ্যে ব্যবধান অর্ধ শতাব্দীর মত। মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী বৃক্ষমেধার পরিচয় দিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করে দ্বীনি খেদমত তথা শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তার এ কর্ম জীবন শুরু হয় ইং ১৯৫২ সন পাবনা জেলার এতিহ্যবাহী হাদল সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান মাওলানার পদে।

অধঃপতিত মুসলিম সমাজ জাতীয় চেতনা হারিয়ে যখন কুসংস্কৃতির মাঝে হাবু ডুবু খাচ্ছিল তখন তিনি শুধু দরস দানকে জাতীয় চেতনার পথ নয় ভেবে কুরআন, হাদীসের ভিত্তিতে সমকালীন অনাগতদের জন্য লিখনীরে স্রোতধারা প্রবাহিত করেন। তার এ লিখনীর প্রথম ফসল ‘আদর্শ মহানবী” : এই তথ্য বহুল চরিত রচনার পরই তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য “রুহানী চিকিৎসা” নামে আরও একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদলে কয়েক বছর দ্বীনি খেদমতের র চলে আসেন সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দেস পদে! মাওলানা সিরাজী নাহেবের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সভা, আকর্ষণীয়, যার ফলে ক্লাসের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে তার নিকট ছাত্রদের ভীড় অব্যহত থাকতো। এদিকে পাঠদান এবং ইসলামী সাহিত্য রচনার অবসরে সমাজের ধর্মীয় সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে বিভিন্ন দ্বীনি জলসায় বিভিন্ন বিতর্ক ইসলামী সেমিনার, কনফারেন্স বাহাছ মোবহেসায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করতেন, শুধু তাই নয় দ্বীনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সজাগ ও সক্রিয়। যেমন নিজ গ্রামের সিনিয়র মাদ্রাসাটি তিনি ইং ১৯৫৩ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম 'পাইকশা ইসলাম নগর ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসা”।

১৯৭২ সনে রংপুর সিলমানের পাড়ায় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম 'সিলমানের পাড়া সিরাজুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা”। এ প্রতিষ্ঠানটি মাওলানা সিরাজীর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত বলে রংপুরবাসী তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সিরাজী সাহেবের নাম , সম্পৃক্ত করে নাম দিয়েছেন “সিরাজুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা”। এ রকম অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ, কবরস্থান, ইদগাহ তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্বীনি শিক্ষা, ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সিরাজগঞ্জ শিক্ষকতাবস্থায় তিনি আরও কিছু সমাজ সেবামূলক কাজের আঞ্জাম দেন, যেমনঃ ১৯৬৫ ইং সনের ২৫শে ফাল্গুন রংপুর জেলার কেচড়া গ্রামে মাজহাব পন্থী ও লা মাজহাবীগণের মধ্যে এক, বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কথা থাকে যে, যে দল পরাজিত হবে তারা বিজয়ীদলে যোগদিবে। স্থানীয় প্রশাসনের সভাপতিত্বে দুইদিন যাবৎ এ সভা চলে, উভয় দলে ২৫/৩০ জন প্রখ্যাত আলিম যোগ দান করেন। দীর্ঘ সময় সভা চলার পর শেষ মুহূর্তে মাওলানা সিরাজী বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং অর্ধ ঘন্টার মধ্যেই বিপক্ষীয় দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

তার কুরআন হাদীস ভিত্তিক সারগর্ভ তথা যুক্তি পূর্ণ ব্যাখ্যায় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতামণ্ডলী মুগ্ধ হন এবং স্থানীয় এলাকায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হয়। এ রকম বাহাছ সভা তার জীবদ্দশায় শতাধিক সংঘটিত হয়েছে এবং অধিকাংশটিতেই তিনি বিজয়ী হয়েছেন। ইং ১৯৬৮ সনে পি, টি, আই, ইনষ্টিটিউট সিরাজগঞ্জে ধর্মীয় শিক্ষক পদে বহাল হন। ঐ বছরই পবিত্র তিনি হজ্জ পালন করেন। অতঃপর ১৯৬৯ ইং সনে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রত্যয়ে সমগ্র দেশের উলামাগণের সাথে মত বিনিময় করে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন নেজামে ইসলামের সক্রিয় কর্মী। তবে একটি ইসলামী দলের টিকিকে তিনি ১৯৭০ সনে বেলকুচী কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকা হতে কামারখন্দ সীটে প্রাদেশিক সদস্য পদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

নির্বাচনে দলগুলো সফলকামে ব্যর্থ হলে সমগ্র দেশের আলিমগণের ওপর নেমে আসে এক বিভিষিকাময় আধাররাত। এ প্রতিকূল পরিবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি সুগভীর প্রতিতি নিয়ে একটি বছর অতিবাহিত করেন। তারপর ১৯৭২ ইং সনে রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৩ সনে রাজশাহী দারুচ্ছালাম আলীয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দেসের পদ অলংকৃত করেন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসেমী সাহেব রাজশাহী মহা গরীর বিভিন্ন মসজিদে বাদ জুমা নিয়মিত কুরআন হাদীসের সুনিপুন ব্যাখ্যাদান করতেন। হযরত কাসেমী সাহেবের ইন্তেকালের পর উক্ত দায়িত্ব মাওলানা সিরাজীর উপর অর্পিত হয়। তিনি মৃত্যু অবধি এ দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহীতে কয়েক বছর থাকার পর তিনি চলে যান শেরপুর শহীদিয়া আলীয়ায় প্রধান মুহাদ্দেসের পদে, সেখানে কয়েক বছর দরস দানের পর চলে আসেন নিজ গ্রামের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে। মাওলানা সিরাজীর নিরলস চেষ্টায় এবং এলাকার তাওহিদী জনতার উদ্দীপনায় মাদ্রাসাটি কামেল ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়। এখানে কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনার পর আবার চলে যান সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বে। মৃত্যু অবধি তিনি এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

মাওলানা সিরাজীর সংগ্রামী জীবনের ও বিভাগ অনেক, যেমনঃ শিক্ষকতা, দ্বীনি জলসা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, কনফারেন্স, সেমিনার ও বাহাছ মোবাহেছায় যোগদান, ইসলামী সাহিত্য রচনা, পীর মাশায়েখ ও বুজুর্গগণের দরবারে ময়দান এবং ইলমে মারেফাতের ছবক গ্রহণ ও বিপথ জনতার মাঝে তাছাউফের তালকিন দান ইত্যাদি।

ইসলামী সাহিত্য রচনার মধ্যে তার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থসমুহ যেমনঃ আদর্শ মহানবী, রুহানী চিকিৎসা, তোহফায়ে হজ্জ ও যিয়ারত, হাকিকাতে কালেমায়ে -তাইয়েবা, হাকিকাতে তাওহিদ, তালাকের হক মিমাংসা, তারাবিহ, ঈদ ও বেতেরের হক মিমাংসা, সাইফুল মাজাহিব, সিরাজুল উলুম ইত্যাদি। মাওলানা সিরাজীর রচনাবলির মধ্যে হাকিকাতে তাওহিদ ও সাইফুল মাজাহিব এ দু'টি গ্রন্থ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে ।১৯৮৬ ইং সনে হাকিকাতে তাওহিদ গ্রন্থখানি প্রকাশ করার পর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন তাকে ইসলামি সাহিত্যিক হিসেবে মর্যাদা দিয়ে বিশেষ সরকারী ভাতা মঞ্জুর করেন। শিক্ষকতাবস্থায় সিরাজী সাহেব আলীম ক্লাসের হাদীস গ্রুপের হেড এক্সামিনার নিযুক্ত হন। তার পর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তক বোখারী শরীফের পরিক্ষক নিযুক্ত হন।

এতগুলি খেদমতের আঞ্জাম দেয়ার পরও ১৯৮৮ সনে ফুরফুরা শরীফের শায়েখ হজরত আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের দ্বিতীয়পুত্র মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী থেকে খেলাফত গ্রহণ করেন। এ খেলাফত নিয়ে যখন তিনি দেশে ফেরেন, দেশবাসী তাকে স্বাগত জানিয়ে তার থেকে পীর প্রদত্ত ছবক সমূহ গ্রহণ করতে থাকেন। শিক্ষকতা, গ্রন্থ রচনা, ফতোয়া ফারায়েজ দান এবং পথ হারা জনগণের মাঝে ইলমে মারিফাতের শিক্ষা বিতরণ, সহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের আঞ্জাম দেয়া যে কতটুকু কষ্টসাধ্য তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই অনুমেয়। তখন এ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো কাজের আঞ্জাম দিতে দিতে ১৯৯১ ইং সনে তিনি খুব অসুস্ত হয়ে পড়েন। এ কঠিন অবস্থার মধ্যদিয়েই তিনি জীবনের শেষ ইতেকাফ ও শেষ ঈদের সালাতের ইমামতি সম্পন্ন করেন। এ সময় সিরাজগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বার খোদার দাবীদার একভণ্ড ফকিরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মাওলানা সিরাজী এ খবর জানতে পেরে এলাকা বাসীকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং এর প্রতিবাদে কয়েকটি সভাও করেন।

অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় তিনি এক সভায় দীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী তাওহিদের সপক্ষে এবং শিরকের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। এ ছিল মর্দে মুজাহিদের জাতির উদ্দেশ্যে শেষ জ্বালাময়ী ভাষণ। এর কয়েক দিন পরেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯২ ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক বাং ১৩৯৮ ১লা ফাল্গুন, রোজ শুক্রবার ভোর বৈলায় ৭২ বছর বয়সে এ সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামী সেনা নায়ক, অকুতভয় সিপাহ্ সালার, নিরলস কর্মবীর, প্রখ্যাত মুহাদ্দেস, হাজার ছাত্র, বন্ধু বান্ধব ও অগণিত ভক্ত বৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহ্র অমোঘ নিয়মে জান্নাতের দিকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন।

তার শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তার হায়াতের অধীর আগ্রহে সময় কাটাচ্ছিলেন। অনেক আলিমগণ বির্তকিত মাসয়ালার ফয়সালার জন্য তার সুস্থতার প্রত্যাশায় কালাতিপাত করছিলেন। তবুও তিনি চলে গেলেন! তিনি ইন্তেকালের সময় স্ত্রী, চার ছেলে, পাঁচ মেয়ে রেখে যান।